১১। সূরা আনফালঃ ১০ম রুকু(৭০-৭৫)আয়াত

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّمَنْ فِىْۤ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰٓى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ ٧٠ : ٨
خَيْرًا مِّمَّاۤ اُخِذَ مِنْكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

৭০. হে নবী! তোমাদের করায়ত্ত যুদ্ধবন্দীদেরকে বলুন, আল্লাহ্ যদি তোমাদের হৃদয়ে ভাল কিছু দেখেন তবে তোমাদের কাছ থেকে যা নেয়া হয়েছে তা থেকে উত্তম কিছু তিনি তোমাদেরকে দান করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

বদর যুদ্ধের বন্দীদিগকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। ইসলাম ও মুসলিমদের সে শত্রু যা তাদেরকে কষ্ট দিতে, মারতে এবং হত্যা করতে কখনোই কোন ত্রুটি করেনি; যখনই কোন রকম সুযোগ পেয়েছে একান্ত নির্দয়ভাবে অত্যাচার-উৎপীড়ন করেছে, মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়ে আসার পর এহেন শত্রুদেরকে প্রাণে বাঁচিয়ে দেয়াটা সাধারণ ব্যাপার ছিল না; এটা ছিল তাদের জন্য বিরাট প্রাপ্তি এবং অসাধারণ দয়া ও করুণা। পক্ষান্তরে মুক্তিপণ হিসেবে তাদের কাছ থেকে যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছিল, তাও ছিল অতি সাধারণ।

এটা আল্লাহর একান্ত দয়া ও মেহেরবাণী যে, এই সাধারণ অর্থ পরিশোধ করতে গিয়ে তাদের যে কষ্ট হয়, তাও তিনি কি চমৎকারভাবে দূর করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, যদি আল্লাহ তোমাদের মন-মানসিকতায় কোন রকম কল্যাণ দেখতে পান, তবে তোমাদের কাছ থেকে যা কিছু নেয়া হয়েছে, তার চেয়ে উত্তম বস্তু তোমাদের দিয়ে দেবেন। তদুপরি তোমাদের অতীত পাপও তিনি ক্ষমা করে দেবেন। এখানে خير অর্থ ঈমান ও নিষ্ঠা। [ফাতহুল কাদীর]

অর্থাৎ মুক্তি লাভের পর সেসব বন্দীদের মধ্যে যারা পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সাথে ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ করবে, তারা যে মুক্তিপণ দিয়েছে, তার চাইতে অধিক ও উত্তম বস্তু পেয়ে যাবে। বন্দীদেরকে মুক্ত করে দেয়ার সাথে সাথে তাদেরকে এমনভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যে, তারা যেন মুক্তি লাভের পর নিজেদের লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করে। সুতরাং বাস্তব ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, তাদের মধ্যে যারা মুসলিম হয়েছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা এবং জান্নাতে সুউচ্চ স্থান দান করা ছাড়াও পার্থিব জীবনে এত অধিক পরিমাণ ধন-সম্পদ দান করেছিলেন, যা তাদের দেয়া মুক্তিপণ অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম ও অধিক ছিল।

প্রসিদ্ধ কুরায়েশ বন্দীদের কয়েকজন

(১) বনু হাশেম গোত্র থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা আববাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব। (২) চাচাতো ভাই 'আক্বীল বিন আবু ত্বালিব (৩) নওফাল বিন হারেছ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব (৪) বনু 'আব্দে শাম্স গোত্রের আমর বিন আবু সুফিয়ান (৫) রাসূল (ছাঃ)-এর জামাতা 'আব্দে শামস গোত্রের আবুল 'আছ বিন রবী ' । ইনি যয়নাবের স্বামী ছিলেন। তার বিনিময় মূল্য হিসাবে বিবাহকালে খাদীজা (রাঃ)-এর দেওয়া কণ্ঠহার দেখে রাসূল (ছাঃ) অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন। পরে তাঁকে যয়নাবকে ফেরত দেওয়ার শর্তে কোনরূপ বিনিময় মূল্য ছাড়াই মুক্তি দেওয়া হয়

(ইবনু হিশাম ১/৬৫২-৫৩)। (৬) বনু জুমাহ গোত্রের আমর বিন উবাই বিন খালাফ (ইবনু হিশাম ২/৩-৮)। ইবনু হিশাম তার তালিকায় আববাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিবের নাম দেননি। কারণ তিনি আগে থেকেই 'মুসলিম' ছিলেন। কিন্তু সম্প্রদায়ের ভয়ে তাঁর ইসলাম গোপন রেখেছিলেন (ইবনু হিশাম ২/৩-টীকা)।

অধিকাংশ মুফাসসির বলেছেন যে, এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতৃব্য আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। কারণ, তিনিও বদরের যুদ্ধবন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার কাছ থেকেও মুক্তিপণ নেয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে তার বৈশিষ্ট ছিল এই যে, মক্কা থেকে তিনি যখন বদর যুদ্ধে যাত্রা করেন, তখন কাফের সৈন্যদের জন্য ব্যয় করার উদ্দেশ্যে বিশ ওকিয়া (স্বর্ণমূদ্রা) সাথে নিয়ে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু সেগুলো ব্যয় করার পূর্বেই তিনি গ্রেফতার হয়ে যান। যখন মুক্তিপণ দেয়ার সময় আসে, তখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমি তো মুসলিম ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আপনার ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহই ভাল জানেন।
যদি আপনার কথা সত্য হয় তবে আল্লাহ আপনাকে এর প্রতিফল দিবেন। আমরা তো শুধু প্রকাশ্য কর্মকাণ্ডের উপর হুকুম দেব। সুতরাং আপনি আপনার নিজের এবং দুই ভাতিজা আকীল ইবন আবী তালেব ও নওফেল ইবন হারেসের মুক্তিপণও পরিশোধ করবেন। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আবেদন করলেন, আমার এত টাকা কোত্থেকে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ কেন, আপনার নিকট কি সে সম্পদগুলো নেই, যা আপনি মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময়ে আপনার স্ত্রী উম্মুল ফযলের নিকট রেখে এসেছেন? আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেনঃ আপনি সে কথা কেমন করে জানলেন? আমি যে রাত্রের অন্ধকারে একান্ত গোপনে সেগুলো আমার স্ত্রীর নিকট অর্পণ করেছিলাম এবং এ ব্যাপারে তৃতীয় কোন লোকই অবগত নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সে ব্যাপারে আমার রব আমাকে বিস্তারিত অবহিত করেছেন।

তখন আব্বাস বললেন, আমার কাছে যে স্বর্ণ ছিল, সেগুলোকেই আমার মুক্তিপণ হিসেবে গণ্য করা হোক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যে সম্পদ আপনি কুফরীর সাহায্যের উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছিলেন, তা তো মুসলিমদের গনীমতের মালে পরিণত হয়ে গেছে, ফিদইয়া বা মুক্তিপণ হতে হবে সেগুলো বাদে। তারপর আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তার নিজের ও দুই ভাতিজার ফিদইয়া দিলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [সীরাতে ইবন হিশাম; ইবন কাসীর] আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম প্রকাশের পর প্রায়ই বলে থাকতেন, আমি তো সে ওয়াদার বিকাশ-বাস্তবতা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করছি। কারণ আমার নিকট থেকে মুক্তিপণ বাবদ বিশ উকিয়া সোনা নেয়া হয়েছিল। অথচ এখন আমার বিশটি গোলাম (ক্রীতদাস) বিভিন্ন স্থানে আমার ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে এবং তাদের কারো ব্যবসায়ই বিশ হাজার দিরহামের কম নয়। [দেখুন, মুস্তাদরাকে হাকিম: ৩/৩২৪]

তদুপরি হজের সময় হাজীদের পানি খাওয়ানোর খেদমতটিও আমাকেই অর্পণ করা হয়েছে যা আমার নিকট এমন এক অমূল্য বিষয় যে, সমগ্র মক্কাবাসীর যাবতীয় ধন-সম্পদও এর তুলনায় তুচ্ছ বলে মনে হয়।

وَ اِنۡ یُّرِیۡدُوۡا خِیَانَتَکَ فَقَدۡ خَانُوا اللّٰہَ مِنۡ قَبۡلُ فَاَمۡکَنَ مِنۡہُمۡ ؕ وَ اللّٰہُ عَلِیۡمٌ حَکِیۡمٌ ৭১ : ৮

৭১. আর তারা আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইলে, তারা তো আগে আল্লাহর সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে; অতঃপর তিনি তাদের উপর (আপনাকে) শক্তিশালী করেছেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

‘বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইলে’ অর্থাৎ, মুখে ইসলাম প্রকাশ করলে এবং উদ্দেশ্য ধোঁকা দেওয়া হলে। তাহলে এর পূর্বে তারা কুফর ও শির্কে পতিত হয়ে কি লাভ করল? এটাই যে, মুসলিমদের হাতে তারা বন্দী হল। এই জন্য ভবিষ্যতেও যদি তারা শিরকের উপর অটল থাকে, তাহলে এ থেকেও অধিক অপমান ও লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের জন্য অন্য কিছু জুটবে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّ ৭২ : ৮ نَصَرُوْۤا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ لَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَ اِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

৭২. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দান করেছে এবং সাহায্য করেছে, তারা পরস্পর পরস্পরের অভিভাবক। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের নেই; আর যদি তারা দ্বীন সম্বন্ধে তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তখন তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, তবে যে সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়। আর তোমরা যা করছ আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের শ্রেণী বিন্যাস করেছেন। তাদের একশ্রেণী হচ্ছে, মুহাজির। যারা তাদের ঘর ও সম্পদ ছেড়ে বের হয়ে এসেছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্যার্থে, তাঁর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে। আর এ পথে তাদের যাবতীয় জান ও মাল ব্যয় করেছে।

মুমিনদের অপর শ্রেণী হচ্ছে, আনসার। যারা তখনকার মদীনাবাসী মুসলিম, তাদের মুহাজির ভাইদেরকে আশ্রয় দিয়েছে তাদের ঘরে, তাদের প্রতি সমব্যথী হয়ে সম্পদ বণ্টন করে দিয়েছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য যুদ্ধ করেছে। এ দু' শ্রেণী একে অপরের বেশী হকদার। আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাদের দু' জন ছিল ভাই। একে অপরের ওয়ারিশ হতো। শেষ পর্যন্ত যখন মীরাসের আয়াত নাযিল হয়, তখন এ বিধানটি রহিত হয়ে যায়। [ইবন কাসীর]

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুহাজির ও আনসারগণ একে অপরের ‘ওলী’। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/৩৬৩] এখানে কুরআনুল কারীম ‘ওলী’ ও ‘বেলায়াত’ শব্দ ব্যবহার করেছে, যার প্রকৃত অর্থ হল বন্ধুত্ব ও গভীর সম্পর্ক। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, হাসান, কাতাদাহ ও মুজাহিদ রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমূখ তাফসীর শাস্ত্রের ইমামগণের মতে এখানে ‘বেলায়াত’ অর্থ উত্তরাধিকার এবং ‘ওলী’ অর্থ উত্তরাধিকারী। এ তাফসীর অনুসারে আয়াতের মর্ম এই যে, মুসলিম মুহাজির ও আনসার

পারস্পরিকভাবে একে অপরের ওয়ারিস হবেন। তাদের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক না থাকবে অমুসলিমদের সাথে, আর না থাকবে সে সমস্ত মুসলিমদের সাথে যারা হিজরত করেনি। পরবর্তীতে এ বিধান রহিত হয়ে যায়। আর কেউ কেউ এখানে এর আভিধানিক অর্থ বন্ধুত্ব ও সাহায্য সহায়তা নিয়েছেন। সে হিসেবে এ বিধান রহিত করার প্রয়োজন পড়ে না। [কুরতুবী]

---- অর্থাৎ এরা মুসলিমদের তৃতীয় গোষ্ঠী। [ইবন কাসীর] যারা ঈমান আনার পরে হিজরত করেনি। তাদের মীরাসের অধিকারী তোমরা নও। তারা এ আয়াত অনুসারে আমল করত, সুতরাং আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণেও ঈমান ও হিজরতে সাথী হওয়ার পরও 'যবিল আরহাম' রক্ত সম্প্‌কৰীয় গোষ্ঠী ওয়ারিস হত না। তারপর যখন তাদের মীরাসের আয়াত (সূরা আল-আনফালের ৭৫ এবং আল-আহযাবের ৬) নাযিল হয় তখন এটা রহিত হয়ে যায় এবং যবিল আরহাম বা রক্তসম্প্‌কৰীয় আত্মীয়দের জন্য মীরাস নির্ধারিত হয়ে যায়। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

---- অর্থাৎ তাদের সাথে উত্তরাধিকারের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে ঠিকই কিন্তু যে কোন অবস্থায় তারাও মুসলিম। যদি তারা নিজেদের দ্বীনের হেফাজতের জন্য মুসলিমদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা মুসলিমদের উপর অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। [তাবারী] কিন্তু তাই বলে ন্যায় ও ইনসাফের অনুবর্তিতার নীতিকে বিসর্জন দেয়া যাবে না। তারা যদি এমন কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, যাদের সাথে তোমাদের যুদ্ধ নয় চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেছে, তবে সে ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে সেসব মুসলিমের সাহায্য করা জায়েয নয়। [ইবন কাসীর]

---- হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে এমনি ঘটনা ঘটেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কার কাফেরদের সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন এবং চুক্তির শর্তে এ বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকে যে, এখন মক্কা থেকে যে ব্যক্তি মদীনায় চলে যাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ফিরিয়ে দেবেন। ঠিক এই সন্ধি চুক্তিকালেই আবু জান্দাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-যাকে কাফেররা মক্কায় বন্দী করে রেখেছিল এবং খেদমতে গিয়ে হাজির হলেন এবং নিজের উৎপীড়নের কাহিনী প্রকাশ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন। যে নবী সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হয়ে আগমন করেছিলেন, একজন নিপীড়িত মুসলিমের ফরিয়াদ শুনে তিনি কি পরিমাণ মর্মাহত হয়েছিলেন, তার অনুমান করাও যে কারও জন্য সম্ভব নয়, কিন্তু এহেন মর্মপীড়া সত্ত্বেও উল্লেখিত আয়াতের হুকুম অনুসারে তিনি তার সাহায্যের ব্যাপারে অপারগতা জানিয়ে ফিরিয়ে দেন। [দেখুন, বুখারী: ২৭০০; মুসনাদে আহমাদ ৪/৩২৩]

আয়াতটি ইসলামী রাষ্ট্রের বিদেশ নীতির ওপরও উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। এর দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে যেসব মুসলমান অবস্থান করে, তাদের দায়িত্বই ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর বর্তায়। বাইরের মুসলমানদের কোন দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর বার্তায় না। একথাটিই নবী (সা.) তার নিম্নোক্ত হাদীসে বলেছেনঃ أَنَا بَرِیءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ بَيْنَ أَظْهُرِ نى الْمُشْرِكِينَ অর্থাৎ "আমার ওপর এমন কোন মুসলমানের সাহায্য-সমর্থন ও হেফাজতের দায়িত্ব নেই যে মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে।" এভাবে সাধারণত যেসব বিবাদের কারণে আন্তর্জাতিক জটিলতা দেখা দেয়, ইসলামী আইন তার শিকড় কেটে দিয়েছে। কারণ যখনই কোন সরকার নিজের রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে অবস্থানকারী কিছু সংখ্যালঘুর দায়িত্ব নিজের মাথায় নিয়ে নেয়, তখনই এর কারণে এমন সব জটিলতা দেখা দেয়, বার বার যুদ্ধের পরও যার কোন মীমাংসা হয় না।

وَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بَعۡضُهُمۡ اَوۡلِيَآءُ بَعۡضٍ ؕ اِلَّا تَفۡعَلُوۡهُ تَكُنۡ فِتۡنَةٌ فِى الۡاَرۡضِ وَ فَسَادٌ كَبِيۡرٌ ৮ : ৭৩

৭৩. আর যারা কুফরী করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের অভিভাবক, যদি তোমরা তা না কর তবে যমীনে ফিতনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দেবে।

সবচেয়ে কাছের বাক্যটির সাথে যদি এ বাক্যটির সম্পর্ক মেনে নেয়া হয় তাহলে এর অর্থ হবে, যেভাবে কাফেররা পরস্পর সাহায্য-সমর্থন করে, তোমরা ঈমানদাররা যদি সেভাবে পরস্পরের সাহায্য-সমর্থন না করো তাহলে পৃথিবীতে বিরাট ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে যাবে। আর যদি ৭২ আয়াত থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত যতগুলো হেদায়াত দেয়া হয়েছে তার সবগুলোর সাথে যদি এর সম্পর্ক মেনে নেয়া হয় তাহলে এ উক্তির অর্থ হবেঃ যদি দারুল ইসলামের মুসলমানরা পরস্পরের অলী ও অভিভাবক না হয়, হিজরত করে যেসব মুসলমান দারুল ইসলামের আসেনি এবং যেসব মুসলমান দারুল কুফরে বসবাস করছে তাদেরকে যদি দারুল ইসলামের অধিবাসীরা নিজেদের রাজনৈতিক অভিভাবকত্ব বহির্ভূত মনে না করে, যদি বাইরের মজলুম মুসলমানদের সাহায্য চাওয়ার পর তাদের সাহায্য না করা হয়, আর যদি এ সঙ্গে যে জাতির সাথে মুসলমানদের চুক্তি থাকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্যের আবেদনকারী মুসলমানদের সাহায্য না করার নীতিও না মেনে চলা হয় এবং যদি মুসলমানরা কাফেরদের সাথে সহযোগিতায় সম্পর্ক খতম না করে, তাহলে পৃথিবীতে বিরাট ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দুই মিল্লাতের লোকেরা পরস্পর ওয়ারিস হবে না। কোন মুসলিম কোন কাফেরকে ওয়ারিস করবে না। অনুরূপভাবে কোন কাফেরও মুসলিমকে ওয়ারিস করবে না। তারপর তিনি আলোচ্য এ আয়াত পাঠ করলেন। [মুস্তাদরাকে হাকিম:২/২৪০; অনুরূপ: মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩৫২; মুসলিম: ১৭৩১; বুখারী: ৬৭৬৪]

সুতরাং কাফেররা পরস্পর ওয়ারিস হবে। কারণ, তারা পরস্পর একে অপরের বন্ধু। এখানেও আল্লাহ্ তাআলা ولي শব্দ ব্যবহার করেছেন। এটি একটি সাধারণ ও ব্যাপকার্থক শব্দ। এতে যেমন ওয়ারাসাত বা উত্তরাধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত, তেমনি অন্তর্ভুক্ত বৈষয়িক সম্পর্ক ও পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়ও।

অর্থাৎ তোমরা যদি এমনটি না কর, তাহলে গোটা পৃথিবীতে ফেৎনা-ফাসাদ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়বে। এ বাক্যটি সে সমস্ত হুকুম-আহকামের সাথে সম্পর্কযুক্ত যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন মুহাজিরীন ও আনসারগণকে একে অপরের অভিভাবক হতে হবে- যাতে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা এবং ওরাসাত তথা উত্তরাধিকারের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। আর কাফেরদের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে হবে। এটা না করে যদি কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব এবং মুমিনদের সাথে শত্রুতা কর তবে দুনিয়াতে গোলযোগ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়বে। [সা'দী]

وَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ هَاجَرُوۡا وَ جٰهَدُوۡا فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيۡنَ اٰوَوۡا وَّ نَصَرُوۡۤا اُولٰٓئِكَ هُمُ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ حَقًّا ؕ لَهُمۡ مَّغۡفِرَةٌ وَّ رِزۡقٌ كَرِيۡمٌ ৮ : ৭৪

৭৪. আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দান করেছে এবং সাহায্য করেছে, তারাই প্রকৃত মুমিন তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে

এটা মুহাজিরীন ও আনসারদের সেই দুই দলের বর্ণনা যা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। এখানে তার পুনর্বার উল্লেখ তাঁদের ফযীলত ও মর্যাদার বর্ণনার জন্য করা হয়েছে। আর পূর্বের উল্লেখ তাঁদের আপোসে পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতার আবশ্যকতা বর্ণনা করার জন্য ছিল।

তাদের জন্য মাগফেরাত নির্ধারিত। যেমন, বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে বর্ণিত রয়েছে যে, "ইসলাম গ্রহণ যেমন তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে নিঃশেষ করে দেয়, তেমনিভাবে হিজরত তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে নিঃশেষ করে দেয়। " [মুসলিমঃ ১২১]

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ؕ وَ اُولُوا الْاَرْحَامِ ৭৫ : ৮
بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

৭৫. আর যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে থেকে জিহাদ করেছে,তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত এবং আত্মীয়রা আল্লাহর বিধানে একে অন্যের জন্য বেশী হকদার। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবকিছু সন্বন্ধে সম্যক অবগত।

এটা এক চতুর্থ দলের বিবরণ; যাঁরা ফযীলতে প্রথম দুই দলের পরবর্তী এবং তৃতীয় দলের (যাঁরা হিজরত করেননি তাঁদের) পূর্ববর্তী স্তরের সাহাবা ছিলেন।

আয়াতে মুহাজিরদের বিভিন্ন শ্রেণীর নির্দেশাবলী বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যদিও তাদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছেন প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজির, যারা হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে হিজরত করেছেন এবং কেউ কেউ রয়েছেন দ্বিতীয় পর্যায়ের মুহাজির, যারা হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে হিজরত করেছেন। এর ফলে তাদের পরকালীন মর্যাদায় পার্থক্য হলেও পার্থিব বিধান মতে তাদের অবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজিরদেরই অনুরূপ। তারা সবাই পরস্পরের ওয়ারিস তথা উত্তরাধিকারী হবেন। সুতরাং প্রথম পর্যায়ের মুহাজিরদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয় পর্যায়ের এই মুহাজিররাও তোমাদেরই পর্যায়ভুক্ত। সে কারণেই উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধিতেও তাদের হুকুম সাধারণ মুহাজিরদের মতই। [বাগভী; সাদী]

এটি সূরা আনফালের সর্বশেষ আয়াত। এর শেষাংশে উত্তরাধিকার আইনের একটি ব্যাপক মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এরই মাধ্যমে সেই সাময়িক বিধানটি বাতিল করে দেয়া হয়েছে, যেটি হিজরতের প্রথম পর্বের মুহাজির ও আনসারদের মাঝে পারস্পরিক ভ্রাতৃবন্ধন স্থাপনের মাধ্যমে একে অপরের উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল।

এ আয়াত এই মূলনীতি বাতলে দিয়েছে যে, মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি আত্মীয়তার মান অনুসারে বন্টন করা কর্তব্য। আর (وَأُولُو الْأَرْحَامِ) সাধারণভাবে সমস্ত আত্মীয়স্বজন অর্থেই বলা হয়। [ইবন কাসীর] তাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আত্মীয়ের অংশ স্বয়ং কুরআনুল করীম সূরা আন-নিসায় নির্ধারিত করে দিয়েছেন। রাসূল

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ‘‘যাবিল ফুরূযে’’ র অংশ দিয়ে দেয়ার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, তা মৃত ব্যক্তির আসাবাগণ অর্থাৎ পিতামহ সম্প্‌কৰীয় আতীয়দের মধ্যে পর্যায়ক্রমিকভাবে দেয়া হবে। [বুখারী: ৬৭৩২]

অর্থাৎ নিকটবর্তী আসাবাকে দূরবতী আসাবা অপেক্ষা অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং নিকটবর্তী আসাবার বর্তমানে দূরবতীকে বঞ্চিত করা হবে। আর ‘আসাবা’ -এর মধ্যে আর কেউ জীবিত না থাকলে অন্যান্য আতীয়দের মধ্যে বন্টন করা হবে। আসাবা ছাড়াও অন্যান্য যেসব লোক আত্মীয় হতে পারে, ফরায়েয শাস্ত্রের পরিভাষায় তাদের বোঝাবার জন্য ‘যওয়িল আরহাম’ শব্দ নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই পরিভাষাটি পরবর্তীকালে হয়েছে। কুরআনুল কারীমে বর্ণিত ‘উলুল আরহাম’ আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রেই ব্যাপক। এতে যওয়িল ফরূয, আসাবা এবং যওয়িল আরহাম সবাই মোটামুটিভাবে অন্তর্ভুক্ত। [ইবন কাসীর]।

সূরা আনফালের শেষ আয়াতের সর্বশেষ বাক্যাংশটি দ্বারা ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের সে ধারাটি বাতিল করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যার ভিত্তিতে মুহাজিরীন ও আনসারগণ আত্মীয়তার কোন বন্ধন না থাকলেও পরস্পরের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী হয়ে গিয়েছিলেন। [বাগভী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] মূলতঃ এ হুকুমটি ছিল একটি সাময়িক হুকুম যা হিজরতের প্রাথমিক পর্যায়ে দেয়া হয়েছিল। সে সাময়িক প্রয়োজন শেষ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা মীরাসের ব্যাপারে তাঁর স্থায়ী বিধান নাযিল করেন যা সুরা আন-নিসায় বর্ণিত হয়েছে।